Development Compilation

Bangladesh Institute of Professional Studies
https://bips.bd/journal
ISSN: 2072-3334 (Print), ISSN: 2663-1547 (Online)

Volume 19 | Issue 2 | October 20, 2026 | Page: 372-384 | Article |

কুয়াকাটার রাখাইন পল্লী ও পর্যটন শিল্প:ঐতিহ্য, সংকট ও সম্ভবনা

Kuakata's Rakhine Village and Tourism Industry: Tradition, Crisis, and Potential

Rashidul Islam[1]

1. 1. B. A. & M. A. Department of History, Univrsity of Chittagong, Chittagong, Bangladesh
   Email: rashidulcu2021@gmail.com

HOW TO CITE

Islam, R. (2026). Kuakata's Rakhine village and tourism industry: Tradition, crisis, and potential. *Development Compilation*, *19*(2), 372–384. https://bips.bd/journal

ARTICLE HISTORY

Received: 25 July 2026
Revised: 10 August 2026
Accepted: 28 September 2026
Available online: 20 October 2026

© 2026 The Author(s). Published by **Development Compilation**, Bangladesh Institute of Professional Studies. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CC BY 4.0

Abstract

Kuakata located in the southern coastal region of Bangladesh, is a promising tourist destination closely associated with the historical and cultural identity of the Rakhine community. In the late eighteenth century, the Rakhine people migrated from Arakan to Bangladesh. Seeking refuge from the persecution of an oppressive Arakanese ruler, they crossed the Bay of Bengal and settled in this region. Through their ancestral heritage, they established a long-standing tradition of weaving and craftsmanship. Their distinctive culture, festivals and way of life have made a unique contribution to Kuakata's tourism industry. However, the unplanned development of tourism, land grabbing by local influential groups, climate change and socioeconomic marginalization have placed the Rakhine villages of Kuakata under increasing threat. This study critically examines the historical heritage of the Rakhine community in Kuakata, the multifaceted challenges they face in contemporary society, their adaptive capacity in response to climate change and the untapped potential of their cultural heritage within Bangladesh's tourism economy. The findings reveal that the traditional handloom weaving industry, the community's principal occupation, is gradually declining. Climate change and recurrent natural disasters have transformed the Rakhine settlements into vulnerable areas along the South Asian coast. Furthermore, their settlements and other important cultural sites, including monasteries, ponds and cremation grounds, are increasingly affected by land grabbing and displacement. Despite considerable tourism potential, Kuakata's tourism industry has not developed adequately because of insufficient infrastructure, weaknesses in institutional frameworks at the local and national-levels, and inadequate communication systems. Based on a qualitative research approach and an analysis of secondary data, this study demonstrates that community-based tourism and state-supported conservation initiatives can help protect Rakhine heritage while promoting sustainable tourism development in Kuakata. The study recommends practical measures for community leaders, non-governmental organizations (NGOs) and the government to revive this centuries-old traditional weaving industry and ensure the sustainable development of the tourism sector.

Keywords: Kuakata, Rakhine community, tourism industry, cultural heritage, land rights.

1. ভূমিকা (Introduction)

কুয়াকাটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও অন্যতম নৈসর্গিক সমুদ্রসৈকত যার দৈর্ঘ্য ১৮ কিলোমিটার। এটি বাংলাদেশের একমাত্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়। দ্রুত বর্ধনশীল উপকূলীয় পর্যটন অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু, যাকে জাতীয় নীতিমালায় উন্নয়নের একটি সফল উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়।একই সাথে এই অঞ্চলটিই এখানকার শতাব্দীপ্রাচীন রাখাইন সম্প্রদায়কে ক্রমশ তাদের ভূমি ও অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছে। জাতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি বেসরকারি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন দশকে ভূমি দখল এবং অপরিকল্পিত পর্যটন-অবকাঠামো নির্মাণের ফলে রাখাইনরা তাদের সমাধিক্ষেত্রের প্রায় ৭০ শতাংশ এবং মন্দিরের অর্ধেক হারিয়েছে।এই চাপ যেমন বাণিজ্যিক, তেমনি পরিবেশগতও। দক্ষিণাঞ্চলীয় ও মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ এবং উপকূলরেখা ভাঙন এসবের সম্মিলিত প্রভাবে মানুষের বসবাসের উপযোগী এলাকা সংকুচিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে তাদের ভূমি হারানো এবং বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত পদ্ধতিগত নিপীড়নকে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যে অঞ্চলগুলোতে রাখাইনরা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাসের দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত মানসিক আঘাত তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে ফিরে যাওয়ার প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছে।কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২,২৪২ জন রাখাইন বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পল্লিতে বসবাস করছেন। তাদের পূর্বপুরুষেরা জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে লড়াই করে যেসব এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই ভূমির অনেক ক্ষেত্রেই রাখাইনরা ভূমিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্প যা এই সম্প্রদায়ের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। কিন্তু বর্তমানে সরবরাহ শৃঙ্খল বা সাপ্লাই চেইনের ব্যর্থতায় এই শিল্প ধ্বংসের পথে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পর্যটন-জনিত কারণে সাংস্কৃতিক অবকাঠামোর ধ্বংসসাধন অর্থাৎ মন্দির ও সমাধিক্ষেত্রগুলোর ক্ষতি, যা সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করে দেয় আর এই সংহতির ওপরই সম্প্রদায়ের অর্থনীতি ও পরিচিতি উভয়ই টিকে আছে। রাখাইনদের বেশ কয়েকটি গ্রাম ও এলাকার পূর্ববর্তী নাম পরিবর্তন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও আধিপত্যের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য কার্যকর উদ্যোগও খুবই সীমিত। এই ক্রমবর্ধমান সংকটের ফলে রাখাইন সম্প্রদায় নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করছে। ফলে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ও দক্ষতা পরিত্যাগ করে মূলধারার জীবিকা ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। কয়েক শতাব্দী ধরে প্রায় প্রতিটি রাখাইন পরিবারের ঘরে মানসম্মত বস্ত্র বয়নের যে ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল, বর্তমানে তা মাত্র কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মূলত শীতকালেই এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ভ্রমণকে মানুষের স্বাধীন ও মৌলিক প্রবৃত্তির একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি বছর বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কোটি কোটি মানুষ ভ্রমণ করে। একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায় বলে ভ্রমণপিপাসুদের কাছে কুয়াকাটার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কুয়াকাটার দীর্ঘ বালুকাময় সমুদ্র সৈকত, সবুজ বন, নীল আকাশ, রঙ্গিন পাল তোলা নৌকা, উঁচু পাহাড়ি ঢাল, ঢেউ খেলানো সমুদ্র ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। কুয়াকাটায় রয়েছে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত বালুকাময় উপকূলীয় অঞ্চল।পর্যটন শিল্প শুধু নিজস্ব খাতেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে না বরং আতিথেয়তা, সেবা খাত, উৎপাদন শিল্প এবং সামগ্রিকভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই পর্যটন শিল্প ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল খাতে পরিণত হয়েছে। কুয়াকাটার প্রচুর সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও এর পর্যটন সম্ভাবনা যথাযথভাবে এখনও কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটন গন্তব্য গড়ে তুলতে অবকাঠামো উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা দরকার।

2. গবেষণা সমস্যা (Research problem)

কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র। যা একই সঙ্গে রাখাইন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বসতি, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বিশেষ করে কুয়াকাটার মিস্ত্রিপাড়া ও পার্শ্ববর্তী রাখাইন পল্লীগুলোতে রাখাইন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, বৌদ্ধবিহার এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পর্যটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। আর এ কারণেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এম.এ ফিল্ড ওয়ার্ক প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে কুয়াকাটার রাখাইন পল্লী ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে বেঁচে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে কুয়াকাটার দ্রুত বিকাশের সঙ্গে রাখাইন পল্লীর ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। এই বাস্তবতাই বর্তমান গবেষণায় সমস্যাটি চিহ্নিত করার প্রধান কারণ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, কুয়াকাটায় রাখাইন জনগোষ্ঠীর আরাকান থেকে বাংলাদেশে আগমন, বসতি বিস্তার এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস যথাযথভাবে নথিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সময়ের সাথে সাথে তাদের সংকট সমূহ যেমন-ভূমির মালিকানা, বসতি সংকোচন, জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং ঐতিহ্যবাহী জীবনব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাও পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, রাখাইন

জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, উৎসব, পোশাক, খাদ্যসংস্কৃতি, তাঁতশিল্প, বৌদ্ধবিহার ও ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পদ। কিন্তু আধুনিকায়ন, পর্যটনের বাণিজ্যিকীকরণ, নতুন প্রজন্মের পেশাগত পরিবর্তন, ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হ্রাস এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এসব ঐতিহ্য কতটা টিকে আছে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সমস্যা। একই সঙ্গে পর্যটন শিল্পের বিকাশ রাখাইন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কী ধরনের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সেটিও অনুসন্ধান করা জরুরি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, কৃষি, মৎস্য ও অন্যান্য জীবিকাভিত্তিক কর্মকাণ্ড তাদের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু পর্যটননির্ভর অর্থনীতির প্রসারের ফলে তাদের পেশা ও আয়ের কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন ঘটছে। পর্যটন থেকে রাখাইন জনগোষ্ঠী কতটা অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পর্যটনের অর্থনৈতিক সুফল ও ঝুঁকি কীভাবে বণ্টিত হচ্ছে এসব বিষয়ও গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পর্যটন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকত, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পাশাপাশি রাখাইন পল্লী, বৌদ্ধবিহার, ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, খাবার, পোশাক ও সাংস্কৃতিক জীবন পর্যটকদের জন্য স্বতন্ত্র আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ কুয়াকাটায় সাংস্কৃতিক ও নৃ-পর্যটন (Cultural and Ethnographic Tourism) বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পর্যটন ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রচারণার ঘাটতি, পরিবেশগত সমস্যা, ভূমি ও সম্পদসংক্রান্ত চাপ এবং রাখাইন সংস্কৃতির যথাযথ সংরক্ষণের অভাব এই সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। কুয়াকাটার রাখাইন পল্লী একদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। অন্যদিকে দ্রুত বিকাশমান পর্যটন শিল্পের অংশ। কিন্তু ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক রূপান্তর, জলবায়ু পরিবর্তন, জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রাখাইন জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করতে না পারা এবং পর্যটন উন্নয়নের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে, তা এখনো পর্যাপ্তভাবে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। তাই এই গবেষণায়, কুয়াকাটা রাখাইন পল্লীর ঐতিহাসিক বিকাশ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংকট ও সম্ভাবনা এবং পর্যটন শিল্পের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ টেকসই পর্যটন উন্নয়নের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হবে।

3. গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণায় একটি গুণগত, অনুসন্ধানমূলক কেস-স্টাডি নকশা ব্যবহার করা হয়েছে, যা কুয়াকাটার মিস্ত্রিপাড়া নামক রাখাইন বসতিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। গবেষণাটি অনুসন্ধানমূলক। কারণ কুয়াকাটার মিস্ত্রিপাড়ার রাখাইন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সংকট, বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সীমাবদ্ধতার পেছনে কাজ করা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে গভীরতর অনুসন্ধান করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যমান গবেষণায় রাখাইন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাগত হ্রাস, আর্থ-সামাজিক সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন ও নীতিগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলেও, মিস্ত্রিপাড়ার স্থানীয় পর্যায়ে এসব সংকট কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে প্রভাবিত করছে সে বিষয়ে তুলনামূলকভাবে সীমিত প্রত্যক্ষ গবেষণা রয়েছে। ফলে পূর্বনির্ধারিত কোনো পরিসংখ্যানগত অনুমান যাচাই করার পরিবর্তে মাঠপর্যায়ের তথ্য ও তথ্যদাতাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্যাগুলোর প্রকৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্তর্নিহিত কার্যপ্রক্রিয়া চিহ্নিত করার জন্য অনুসন্ধানমূলক নকশা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এটি একটি কেস-স্টাডি। কারণ গবেষণাটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও সামাজিক একক, পটুয়াখালীর কুয়াকাটার লতাচাপলী ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়ার রাখাইন বসতি কে একটি স্বতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ গবেষণা-কেস হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই নির্দিষ্ট কেসের ঐতিহাসিক পটভূমি, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বাজার-সংযোগ, সাংস্কৃতিক চর্চা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং বিদ্যমান সংকটকে এর নিজস্ব সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গভীর সাক্ষাৎকারগুলো এর বিপরীত কাজ করে, মানুষের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনার মাধ্যমে ঠিক সেই কার্যপ্রণালীগুলোকেই সামনে নিয়ে আসে। এই নকশাটি ইচ্ছাকৃতভাবে গুণগত এবং এতে কোনো পরিমাণগত বা মিশ্র-পদ্ধতির দাবি করা হয়নি। এটি পরিসংখ্যানগত সাধারণীকরণের পরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক গভীরতা এবং স্থানান্তরযোগ্যতা খোঁজে। প্রাথমিক তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এম.এ ফিল্ডওয়ার্ক প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে পটুয়াখালীর কুয়াকাটার লতাচাপলী ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়ায় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালিত দুটি মূল-তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম তথ্যদাতা, যিনি হস্তশিল্প ও বস্ত্র ব্যবসায় কর্মরত একজন স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একজন জ্ঞানী ও অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যিনি রাখাইন উৎপাদকদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করার জন্য উপযুক্ত অবস্থানে ছিলেন। দ্বিতীয়জন একজন স্থানীয় প্রবীণ। তাঁকে বসতির ইতিহাস, পবিত্র প্রথা এবং জনতাত্ত্বিক স্মৃতির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। উভয় সাক্ষাৎকারই ছিল আধা-কাঠামোগত এবং অনুসন্ধানমূলক, যেখানে উন্মুক্ত প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছিল যা প্রত্যেক তথ্যদাতাকে উৎপাদন, বাজার প্রবেশাধিকার, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি নিজের মতো করে জোর দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। তৃতীয়জন ছিলেন একজন নিরাপত্তা কর্মী, যিনি কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন নিয়ে তথ্য দেন। চতুর্থজন ছিলেন ট্যুর গাইড অপারেটর। তিনি নদী ভাঙ্গন ও এর ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেন। আরেকজন ছিলেন হোটেল মালিক যিনি যাতায়াত দুর্ভোগ ও এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে তথ্য দেন। প্রাপ্ত বিবরণগুলো বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যগত প্রতিবন্ধকতাগুলোর জন্য আরোহী পদ্ধতিতে কোড করা হয়েছিল। অল্প সংখ্যক গভীর তথ্যসমৃদ্ধ মূল তথ্যদাতা একটি কার্যপ্রণালী-কেন্দ্রিক

অনুসন্ধানমূলক গবেষণার জন্য উপযুক্ত। যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক বিস্তৃতির পরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক গভীরতা এবং কার্যকারণ প্রক্রিয়া শনাক্তকরণই লক্ষ্য। গৌণ তথ্যগুলো প্রাসঙ্গিক এবং সমর্থনকারী ভিত্তি প্রদান করে এবং এগুলো তিনটি ধারায় বিভক্ত। প্রথমটি হলো সমকক্ষ পর্যালোচিত একাডেমিক কাজ যা সাধারণত সমীক্ষা-ভিত্তিক এবং ভৌগোলিকভাবে ব্যাপক। যা প্রথমত, রাখাইন জনগোষ্ঠীর জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, এতে সরকারি ও বহুপাক্ষিক নীতি-দলিলগুলো (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামোসহ) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব দলিলে কী অন্তর্ভুক্ত আছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে কী বাদ পড়েছে, তা পর্যালোচনার মাধ্যমে নীতিগত ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, এতে রাখাইনদের সাংস্কৃতিক স্থাপনা বা নিদর্শন হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নথিবদ্ধ প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার কাজের এই বিভাজনটি স্পষ্ট। গৌণ উৎসগুলো জনমিতি, জলবায়ু-জনিত বাস্তুচ্যুতি ও নীতিগত প্রেক্ষাপটকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষাৎকারগুলো নির্দিষ্টভাবে মিস্ত্রিপাড়া এলাকা এবং বিষয়টির কার্যপদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করে। বিশেষ করে জলবায়ু-জনিত বাস্তুচ্যুতি ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন হারানোর বিষয়গুলো সরাসরি মাঠপর্যায়ের কাজের পরিবর্তে গৌণ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার এই দুটি ধারাকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা হয়েছে, যাতে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বয়ানগুলো নথিবদ্ধ তথ্যের মাধ্যমে যাচাই ও যথাযথ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা যায়। গবেষণা-কাঠামোর কিছু সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অল্প কয়েকজন মূল তথ্যদাতার (Key Informants) ওপর ভিত্তি করে সংগৃহীত এবং এর পরিধি মূলত অনুসন্ধানমূলক। তাই প্রাপ্ত ফলাফলগুলো পরিসংখ্যানগতভাবে সাধারণীকরণের যোগ্য না হয়ে বরং ব্যাখ্যামূলক ও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট-নির্ভর। জলবায়ু-জনিত বাস্তুচ্যুতি ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন হারানোর বিষয়গুলো সরাসরি মাঠপর্যায়ের কাজের পরিবর্তে গৌণ উৎসের মাধ্যমে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। গবেষণার এই সীমাবদ্ধতাগুলো এর সামগ্রিক অবদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্দিষ্ট বিষয়ে মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফলে বর্জন বা প্রান্তিকীকরণের এমন সব সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া উঠে আসে যা বড় পরিসরের জরিপ বা নীতি-দলিলগুলোতে প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়; এর মাধ্যমে বাস্তব-ভিত্তিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং এই গবেষণাটিকে একটি অনুসন্ধানমূলক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়, যা এমন সব প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রদান করে যাকে পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে ও একাধিক এলাকায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে যাচাই ও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

4. সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

কুয়াকাটার রাখাইন সম্প্রদায় ও পর্যটন শিল্পের সম্পর্ক নিয়ে ইতিপূর্বে বেশ কিছু তাত্ত্বিক ও মাঠপর্যায়ের কাজ হয়েছে। রাখাইনদের আগমন ও ইতিহাস নিয়ে গবেষকগণ বিস্তারিত কাজ করেছেন। মোস্তফা মজিদ (২০০৭) তাঁর "বাংলাদেশে রাখাইন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কীভাবে ১৭৮৪ সালে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে রাখাইনরা পটুয়াখালীর সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জনবসতি গড়ে তোলে। রাখাইন বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং মিয়ানমারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতিগোষ্ঠী। কখনো কখনো তাদের 'মগ' নামেও অভিহিত করা হয়। তারা মিয়ানমারের একটি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিগোষ্ঠী হিসেবেও পরিচিত। বর্তমানে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গঠন করেছে। এই অঞ্চলটি পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আরাকান (Arakan) নামে পরিচিত ছিল। মিয়ানমারের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশেরও বেশি রাখাইন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। 'রাখাইন' শব্দটি পালি শব্দ 'আরক্ষ' (Arakhah) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'রক্ষক' বা 'রক্ষাকারী'। এটি বার্মিজ 'বিলু' (Bilu) শব্দের সমার্থক। ঐতিহাসিকভাবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাখাইন জনগোষ্ঠীর একটি অংশ আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা প্রধানত বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে বসতি স্থাপন করেছে। বাংলাদেশে বসবাসরত রাখাইন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কক্সবাজার পৌরসভা, খারাংখালী, খুরুশকুল, চৌফলদণ্ডী, রামু সদর, পানেরছড়া, আশকরকাটা, টেকনাফ সদর, হ্নীলা, চকরিয়ার হারবাং, মহেশখালীর গোরকঘাটা, খেপুপাড়া এবং পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় কেন্দ্রীভূতভাবে বসবাস করে। এছাড়াও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কিছু রাখাইন জনগোষ্ঠী নিজেদের মারমা নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এর বাইরে বরগুনার তালতলী এবং পটুয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায়ও কিছু রাখাইন জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে। রাখাইনদের বসতি স্থাপনের সংখ্যা জানিয়েছিলেন ৪০-৫০ হাজারের মত। কোম্পানি ১৮০০ সালের মে মাসে রাখাইনদের অধিকতর অভিবাসন বন্ধের আদেশনামা জারি করে। ১৭৮৫ সালের তামাদা পালিয়ে গেলে ব্রাহ্মরাজ বোধ পায়া আরাকানকে ব্রহ্মদেশের সাথে অর্ন্তভুক্ত করে প্রায় দুই লক্ষ আরাকানী নারী-পুরুষ হত্যা করে এবং সমসংখ্যক দাস হিসেবে বার্মায় প্রেরণ করে। স্যার ওয়াল্টার হেমিল্টন রামুতে প্রায় লক্ষাধিক আরাকানী শরণার্থী দেখেছিলেন। ইংরেজরা তাদেরকে দ্বিতীয় দফায় কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে পূর্ণবাসন করেন। এটি ছিল রাখাইনদের বড় ধরণের অভিবাসন। বর্তমানে বাংলাদেশে কক্সবাজারের পৌর এলাকা, খুরুশকুল, চৌফলদন্ডী, রামু, পানের ছড়া, আশকর কাটা, টেকনাফ, খারাংখালী, হ্নীলা, চকরিয়ার হারবাং, মহেশখালীর গোরকঘাটা এবং পটুয়খালীর খেপুপাড়া ও কুয়াকাটায় রাখাইনরা বসবাস করছে। আদিবাসী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা 'কাপেং ফাউন্ডেশন' (Kapaeeng Foundation)-এর বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদনে (যেমন- Human Rights Report 2019-2020) রাখাইনদের বর্তমান অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টি তীব্রভাবে উঠে এসেছে। সম্প্রদায়কে একটি "অদৃশ্য সংখ্যালঘু" গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করেছেন, যাদের দুর্বল রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তাদের অধঃপতনকে আরও ত্বরান্বিত করছে। সামগ্রিকভাবে এই

গবেষণাগুলো বাস্তব ও তথ্য-উপাত্ত-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ধারাটি এখন আর বিতর্কের বিষয় নয়। তবে এসব গবেষণার একটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা হলো এদের বিশ্লেষণের গভীরতা বা দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা। তারা সামগ্রিক জনসংখ্যা, ভাষা ও প্রতিনিধিত্বের মতো বৃহৎ পরিসরে অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরলেও, ঠিক কী প্রক্রিয়ায় বা কোন পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে এই ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে, তার বিশদ বিশ্লেষণ করেনি। কেন নির্দিষ্ট কিছুপরিবার তাদের অবস্থান হারিয়ে ফেলে তা তাত্ত্বিকভাবে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং নীতি-নির্ধারণী পরিবেশ থেকে জনতাত্ত্বিক পরিণতির মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্কটিও অবহেলিত থেকে গেছে। উপকূলীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া কেন রাখাইনদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যায়, তার সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'নির্ভরশীলতা' (dependency) ও 'ছিটমহল-অর্থনীতি' (enclaveeconomy) সংক্রান্ত তত্ত্বে। ব্রিটন (১৯৮২) দেখিয়েছেন যে, প্রান্তিক অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ প্রায়শই মূলধারার বা মেট্রোপলিটন নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় করে; এতে অর্থনৈতিক সুবিধা বা মূল্য সংযোজনের প্রবাহ বাইরের মালিকানাধীন কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী কেবল অধীনস্থ ও স্বল্প-লাভজনক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এটি এমন এক ছিটমহল-অর্থনীতি যা উন্নয়নের সুফল ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তা কুক্ষিগত করে রাখে। সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের জনসংখ্যা, জমি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়েছে এবং একটি ছোট শোষিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আইসিডিপি-২০১৪ সালে "কারিতাস" পরিচালিত রাখাইন জরিপে দেখা যায় যে, বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে রাখাইন বৌদ্ধ জনসংখ্যা প্রায় ২৫৬১ জন যারা বসবাস করছেন। ১৯০০-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যেখানে পূর্বে তাদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫,০০০। বয়স্কদের সাথে কথা বলার পর জানা যায় যে, প্রায় ২৩৭টি রাখাইন গ্রাম ছিল। কিন্তু এখন, পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ২৬টি, গলাচিপা উপজেলায় ৪টি এবং বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ১৩টি রাখাইন গ্রাম রয়েছে। প্রায় ৮০% রাখাইন গ্রাম উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে জনসংখ্যা প্রায় ৯৫% হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮ সালে কলাপাড়ায় ৭০০০ রাখাইন পরিবার ছিল, এখন তা কমে ১১০০ জনে ঠেকেছে। তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের কৌশল হারিয়ে ফেলেছে। জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে, তারা বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য, হয়রানি, জমি দখল, নারী ধর্ষণ, ধর্মীয় রীতি লঙ্ঘন এবং পরোক্ষ চাপ ইত্যাদির শিকার হচ্ছে। ২০১০-২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এই লঙ্ঘনগুলো পাওয়া গেছে এবং তাদের অনেকগুলি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। রাখাইন গ্রামগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে, মন্দির ও সমাধিস্থল দখল হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের জমি ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাবশালী দখলদারদের কবলে পড়ছে। একসময় এই অঞ্চলে ৫০ হাজারেরও বেশি রাখাইন মানুষের বসবাস ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র প্রায় ২,৫০০- তে। ফলে তাদের ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে এবং ভবিষ্যৎও অনিশ্চয়তার মুখে। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্র অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (State Acquisition and Tenancy Act) অনুযায়ী, পটুয়াখালীর রাখাইনদের বাকেরগঞ্জের "মগ" নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের ভূমি হস্তান্তরের স্বার্থ রক্ষার জন্য ওই আইনের ৯৭ ধারা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন নথি অনুযায়ী, বর্তমানে এই অঞ্চলে বসবাসকারী রাখাইন পরিবারগুলোর ৯০ শতাংশেরও বেশি ভূমিহীন। অথচ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে মাত্র ২০-২৫ শতাংশ রাখাইন ভূমিহীন ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় পুরো সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইনগত মালিকানার নথি থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী ভূমিদখলকারী গোষ্ঠীগুলো জাল দলিল, ভয়ভীতি প্রদর্শন, আইনের ফাঁকফোকর এবং দীর্ঘমেয়াদি মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে বারবার রাখাইনদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। ভূমিদখল এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন এবং আইনের নানা ফাঁকফোকর ব্যবহার করে এসব দখল কার্যকর করা হচ্ছে। বরিশাল আঞ্চলিক কারিতাস কার্যালয়ের ভূমি ও মামলা পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা মং মিয়া বলেন, বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি ও দলিল জাল করার মাধ্যমে ৯০-৯৫ শতাংশ রাখাইন তাদের জমি হারিয়েছে। তাঁর মতে, বর্তমানে বিদ্যমান রাখাইন পল্লিগুলোর মধ্যে প্রায় ২৬-২৭টি পল্লিতে জমির মালিকানা নিয়ে জালিয়াতি হয়েছে। জাল দলিল, প্রভাবশালীদের আগ্রাসন এবং আইনি জটিলতার কারণে রাখাইনরা তাদের পৈতৃক ভিটা ও দেবোত্তর সম্পত্তি হারাচ্ছে, যা তাদের দেশান্তরী হতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প দ্রুত বিকাশমান ব্যবসায়িক খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। World Travel and Tourism Council (WTTC)-এর মতে, ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ৪.৪ শতাংশ, অর্থাৎ ১,২৫২.৮ বিলিয়ন টাকা, পর্যটন খাত থেকে আসবে। অপরিকল্পিত ও টেকসই নয় এমন উপকূলীয় পর্যটন উন্নয়ন প্রাকৃতিক পরিবেশ, পর্যটন অবকাঠামো, পর্যটন কর্মকাণ্ড এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। Rankin, Ballantyne, and Pickering (২০১৫)-এর গবেষণায় দেখা যায়, উপকূলীয় পর্যটনকেন্দ্রে অতিরিক্ত পর্যটন কর্মকাণ্ড জীববৈচিত্র্য ও সামুদ্রিক প্রাণী প্রজাতির জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। একইভাবে উপকূলীয় পর্যটন উপকূলীয় দূষণ, মাছ ধরার কর্মকাণ্ডে বাধা, প্রবালপ্রাচীরের ক্ষতি এবং সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির মতো নেতিবাচক প্রভাবও সৃষ্টি করতে পারে। কুয়াকাটাকে একটি আকর্ষণীয় ও কাঙ্ক্ষিত পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেবা বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে পর্যটকদের সন্তুষ্টির মাত্রা ভবিষ্যতে সেই স্থানে তাদের পুনরায় ভ্রমণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। কুয়াকাটায় প্রাকৃতিক পর্যটনসম্পদের কোনো ঘাটতি না থাকলেও পর্যটন খাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখনো পর্যাপ্ত নয়। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সমুদ্রসৈকতকে উন্নয়ন এবং সব ধরনের পর্যটককে আকৃষ্ট ও সুবিধা প্রদানের জন্য এখানে পর্যাপ্ত পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যকর নীতিমালা ছিল না। পর্যটনের সাথে নৃগোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় দেখা যায়, অপরিকল্পিত পর্যটনের ফলে রাখাইনদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং মূলধারার সংস্কৃতির আগ্রাসনে তাদের নিজস্ব

ভাষা ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। 'কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন' (CBT)-এর ওপর জোর দেওয়া, যেখানে স্থানীয় রাখাইনরা সরাসরি পর্যটন অর্থনীতির অংশীদার হতে পারে।

5. গবেষণার উদ্দেশ্য (Research Objectives)

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. কুয়াকাটায় রাখাইনদের ঐতিহাসিক আগমন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করা।

২. কুয়াকাটার প্রধান পর্যটন আকর্ষণগুলো চিহ্নিত করা, পর্যটনের প্রসার ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কারণে রাখাইন পল্লীগুলো বর্তমানে যেসব বহুমুখী সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করা।

৩. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে রাখাইন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অন্বেষণ করা এবং তা সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করা।
৪. পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য কুয়াকাটার পর্যটন শিল্পের প্রধান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত এবং তা দূর করে টেকসই পর্যটন গড়ে তুলতে সরকারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

৫. রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভূমি দখল, জীবিকার সংকট এবং উন্নত জীবনযাত্রার প্রত্যাশায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল কিংবা বিদেশে অভিবাসনের প্রবণতা রোধ করা।

6. ফলাফল ও মূল্যায়ন(Findings and Evaluation)

তাঁত শিল্পের বিলুপ্তি (Decline of the Handloom Industry)

কুয়াকাটার রাখাইন জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা হলো হস্তচালিত তাঁত বয়ন, যা একই সাথে তাদের জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পরিচায়ক। কামরান ও রহমান উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকভাবে এই জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি তাদের বয়নশিল্পকে কেন্দ্র করে সংগঠিত ছিল। কৃষিকাজ কমে যাওয়ার পর রাখাইনরা এই কারুশিল্পের দিকে ঝুঁকেছিল এবং তারা একসময় গৃহস্থালির ব্যবহার ও বিনিময়ের জন্য কাপড় সরবরাহ করত। রাখাইন নারীরাই ছিলেন প্রধান কারিগর। ফারজানা যেমনটি নথিভুক্ত করেছেন, তারা লুঙ্গি, স্কার্ফ, রুমাল এবং শালের মতো হস্তনির্মিত পোশাক তৈরি করতেন এবং কুয়াকাটায় 'রাখাইন মহিলা বাজার' নামে তাদের একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক স্থান ছিল। বয়ন কেবল আয়ের উৎস ছিল না। এর সাথে যুক্ত ছিল নকশা, পোশাক এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দক্ষতার এক স্বতন্ত্র বস্তুগত সংস্কৃতি, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতো। ফলে কুয়াকাটায় তাঁতের ভাগ্য এবং রাখাইন পরিচয়ের ভাগ্য এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাই সম্প্রদায়ের পতনের যেকোনো বিবরণ এই উৎপাদনশীল ভিত্তির ক্ষয় দিয়েই শুরু করতে হবে। সেই ক্ষয়ের মাত্রা প্রকট। ২০১৯ সালে কামরান ও রহমান পরিচালিত ক্ষেত্র সমীক্ষায়, বত্রিশ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র একজন তখনও কাপড় বুনতেন, যেখানে চৌদ্দজন ছোটখাটো কাপড়ের ব্যবসায় নেমেছিলেন, অর্থাৎ উৎপাদনের পরিবর্তে কাপড় কেনাবেচা করতেন, বাকিরা চায়ের দোকান, অন্যান্য দোকান ও বিবিধ ছোটখাটো ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। যে শিল্পটি একসময় স্থানীয় অর্থনীতির ভিত্তি ছিল, তা এখন সেই নমুনায় একজন মাত্র সক্রিয় বুননশিল্পীর মধ্যে টিকে আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই পতনের কারণ হিসেবে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ এবং তার সাথে বাজার প্রতিযোগিতাকে দায়ী করা হয়। যেখানে অভিবাসনের ফলে উপদ্বীপটি নতুন রূপ পাওয়ায় একটি দেশীয় শিল্প বাঙালি মূলধারার কাছে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ও শোষিত হয়ে যায়। এই ব্যাখ্যাটি ভুল নয়, তবে এটি অসম্পূর্ণ। এটি বুননশিল্পকে অকার্যকর করে তোলার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটি চিহ্নিত না করেই, বুননশিল্পীদের বিলুপ্তি এবং বাণিজ্যে উৎপাদনের সংকোচনের মতো পরিণতির বর্ণনা দেয়। মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার সেই অনুপস্থিত কার্যপ্রণালীটি পূরণ করে। প্রথম তথ্যদাতা, যিনি তাঁতশিল্পে কর্মরত একজন স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি সমস্যাটিকে কোনো ম্লান হয়ে আসা সাংস্কৃতিক অঙ্গীকারের মধ্যে নয়, বরং উপকরণের এক সুনির্দিষ্ট ব্যর্থতার মধ্যে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, এই সম্প্রদায়ের কাছে এখনও তাদের তাঁত এবং বুননের ইচ্ছা আছে; যা তারা জোগাড় করতে পারে না তা হলো কাঁচামাল। সুতা এবং রং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় না এবং ঢাকা থেকে আনতে হয়। আর যখন আসেও, তখন তা তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতির মধ্যে থাকে। দক্ষতা, সরঞ্জাম এবং চাহিদা সবই এখনও আছে। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। তাই বুনন থেকে আয় নগণ্য ও অনিয়মিত এবং লক্ষণীয়ভাবে কোনো এনজিও বা রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি এই সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রদায়ের সাথে কখনও কাজ করেনি। এই সাক্ষ্যটি বিশ্লেষণাত্মকভাবে চূড়ান্ত। এটি রাখাইন বুননের পতনকে একটি সাংস্কৃতিক ব্যর্থতা থেকে একটি সরবরাহগত ব্যর্থতায় রূপান্তরিত করে; পরিচয়ের পশ্চাদপসরণের পরিবর্তে উপকরণ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখায়। এই ধরনের একটি প্রতিবন্ধকতা কার্যকর এবং এটি সমাধানযোগ্য। সুতা এবং রঙের নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী সরবরাহ উৎপাদনকে এমনভাবে পুনরুদ্ধার করবে যা কোনো পরিমাণ সাংস্কৃতিক উৎসাহ দিয়েও সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকারটি তাই সমস্যাটিকে এমন একটি ক্ষেত্রে নিয়ে যায় যা সমাধান করতে উন্নয়ন নীতি সক্ষম একটি

সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যবস্থা করা এবং যা তারা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। এই উপেক্ষাই এই অধ্যায়ের মূল পর্যবেক্ষণ। কুয়াকাটায় উন্নয়নের মনোযোগ যেখানেই পৌঁছেছে, তা উপকরণের পরিবর্তে বিপণনের উপরই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। দরিদ্র-বান্ধব পর্যটন কর্মসূচি রাখাইনদেরকে অংশগ্রহণকারী ও বিক্রেতা হিসেবে পর্যটন অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, কিন্তু একসময়কার কারুশিল্পভিত্তিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে মেরামত করতে চায় না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর আওতায় উৎপাদন-উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। তাঁতগুলো টিকে আছে, দক্ষতাও অটুট এবং চাহিদাও বিদ্যমান। যা প্রত্যাহার করা হয়েছে অথবা যা কখনোই প্রদান করা হয়নি তা হলো উৎপাদন অব্যাহত রাখার মতো প্রয়োজনীয় লজিস্টিক বা ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা এবং এমন সুরক্ষা ব্যবস্থা যা এর অর্থনৈতিক মূল্যকে সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধরে রাখতে পারত। অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এমন উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ এটাই যেখানে কোনো সম্প্রদায় নিজের ইচ্ছায় নয় বরং এমন এক নীতি-কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে যা কখনোই তাদের কর্মপরিচালনাগত প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় নেয় না। তবে এর পরবর্তী বিষয়টি আশাব্যঞ্জক। যেহেতু এই বাধাটি সাংস্কৃতিক নয় বরং ব্যবস্থাপনাগত বা লজিস্টিক প্রকৃতির, তাই এর সমাধান সম্ভব।সুনির্দিষ্টভাবে উপকরণ সংগ্রহের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এমন এক অধঃপতন রোধ করা যেতে পারে যাকে প্রায়শই ভুলবশত 'সাংস্কৃতিক নিয়তি' বলে ধরে নেওয়া হয়। সরবরাহ-শৃঙ্খলের (Supply-Chain) এই ব্যর্থতাকে নীতিগত ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করাই হলো তা দূর করার প্রথম পদক্ষেপ।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও জলবায়ু পরিবর্তন (Cultural Aggression and Climate Change)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-মধ্য উপকূলীয় অঞ্চলের কলাপাড়া উপজেলার মিস্ত্রিপাড়া রাখাইন সম্প্রদায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দুর্যোগ-ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলরেখায় বসবাস করে। তাদের এই দুরবস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওপর আরোপিত অসম ঝুঁকির বিষয়টিকেই তুলে ধরে। ওই এলাকার খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ৮৩.৮ শতাংশ রাখাইন উত্তরদাতা গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছেন; ৮৬.৫ শতাংশ ঘূর্ণিঝড়কে একটি নিয়মিত হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ৯১.৯ শতাংশ জানিয়েছেন যে, ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর সময় তাঁদের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অথচ দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা পেয়েছেন মাত্র ৭৩ শতাংশ মানুষ। এই ব্যবধানটি চরম ঝুঁকির পাশাপাশি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও অসমতার বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে। এই ঝুঁকি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং কাঠামোগত। কারণ গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। সমুদ্রের এগিয়ে আসার বিষয়টি সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধরা পড়ে। মিস্ত্রিপাড়ার একজন তাঁতি জানান যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই সমুদ্রতট প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার দূর থেকে সরে এসে মাত্র দুই কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে। এই ঝুঁকির বিষয়ে প্রচলিত নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। জাতীয় কৌশল অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততার অনুপ্রবেশকে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে ফসলের ফলন এতটাই ব্যাহত হচ্ছে যে, পটুয়াখালীতে গড় ধান উৎপাদন জাতীয় গড়ের চেয়ে প্রায় ৪০ শতাংশ কম। এছাড়া বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাঝারি মাত্রার পরিস্থিতিতে লবণাক্ততার কারণে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ (০.২ মিলিয়ন) টন ফসলহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য কৃষিখাতের ওপর এই চাপ তাদের জীবনযাত্রার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবারগুলো লবণাক্ততা ও ভূমি দখলের কারণে আবাদি জমি হারানোর কথা উল্লেখ করে এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে ক্ষুদ্র পরিসরে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ওপর নির্ভর করার বিষয়টি তুলে ধরেন। বর্তমান অভিযোজন নীতিতে লবণাক্ততার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই দিকটিকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা, বাঁধ এবং ফসলের সহনশীলতা কৃষি-কেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ভুল নয়। তবে এটি অসম্পূর্ণ। এটি এমন এক স্থানচ্যুতির কেবল অর্থনৈতিক দিকটিই তুলে ধরে, যার গভীরতর স্তরটি এর দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। সেই গভীরতর স্তরটি কেবল সম্প্রদায়ের শেকড়-গভীর অবস্থানের প্রেক্ষাপটেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মিস্ত্রিপাড়ার এক প্রবীণ বাসিন্দা, তাঁর সম্প্রদায়ের প্রায় দুই শতাব্দীর নিরবিচ্ছিন্ন বসতি স্থাপনের ইতিহাস তুলে ধরেন। ১৭৮৪ সালে বোদোপায়ার (ইড়ফধঢ়ধুধ) অভিযানের মুখে আরাকান থেকে তাঁর পূর্বপুরুষদের পালিয়ে আসার পর এই বসতি গড়ে উঠেছিল। তিনি জানান, গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁতি। যিনি 'মিস্ত্রি' বা তালুকদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি এই সম্প্রদায়কে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রায় ৬০ একর জমি দান করেছিলেন। এখানে 'পরিচয়' কোনো নথিবদ্ধ বিষয় নয়, বরং তা জীবন্ত ও পবিত্র সব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চর্চিত ও টিকে থাকে, যেমন সাংগ্রাই জল উৎসব, বৌদ্ধ পূর্ণিমা পালন, ফানুস ওড়ানো এবং তাদের নিজস্ব খাদ্যসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ 'নাপ্পি'। এই চর্চাগুলোকে মন্দির, সমাধিক্ষেত্র ও শ্মশানের মতো ভৌত স্থানগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়; অথচ বিভিন্ন নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ঠিক এই স্থানগুলোই ধ্বংস বা উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত তিন দশকে রাখাইন সম্প্রদায় তাদের সমাধিক্ষেত্রের ৭০ শতাংশ এবং মন্দিরের ৫০ শতাংশ হারিয়েছে; জরিপকৃত ৩৯টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ২২টিতে এখনো অক্ষত সমাধিক্ষেত্র টিকে আছে। জরিপ-ভিত্তিক গবেষণায় এই বিলুপ্তির দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি উঠে এসেছে। ১৯০৮ সালে বিদ্যমান ১৯০টি বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে মাত্র একটি উল্লেখযোগ্যভাবে টিকে আছে এবং শতবর্ষী একটি মঠের ৯৯ শতাংশ জমিই বেদখল হয়ে গেছে। এই বৈপরীত্য জলবায়ু অভিযোজন নীতির মূল কাঠামোয় অনুপস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান দলিল 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-তে কৃষি, মৎস্যসম্পদ, বনভূমি, পানিসম্পদ এবং বাঁধ, পোল্ডার ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার মতো ভৌত অবকাঠামোকে 'সুরক্ষিত সম্পদ' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং কেবল এগুলোকেই দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ যোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ সাংস্কৃতিক স্মৃতি-কাঠামো যেমন সমাধিক্ষেত্র, শ্মশান এবং মন্দিরের

ভিত্তি যার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে নবায়ন করে, তার কোনো উল্লেখই ওই তালিকায় নেই। জলবায়ুজনিত চাপের মুখে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চরম ঝুঁকির বিষয়টি যা অভিযোজন পরিকল্পনায় প্রায়শই উপেক্ষিত থাকে। 'অঅর্থনৈতিক ক্ষতি ও লোকসান'-এর কাঠামো, যা বাজারব্যবস্থা বা পুনর্বাসন বাজেটের আওতায় পড়ে না এমন সাংস্কৃতিক ও আত্মপরিচয়-সংক্রান্ত ক্ষতির কথা বলে। এসবের নিরিখে বিচার করলে এই উপেক্ষার বিষয়টি মূলত একটি 'স্বীকৃতি-জনিত ঘাটতি' হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পরিচালিত সাম্প্রতিক পরিমাণগত গবেষণাও এই যুক্তিকে তথ্য-প্রমাণসহ জোরালো ভিত্তি প্রদান করে। শ্যামনগরের একটি জনসমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ক্ষতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান বর্জন বা বাতিল করার মতো বিষয়গুলো ছিল অন্যতম গুরুতর 'অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি'। এছাড়া পবিত্র স্থান হারানোর বিষয়টিও পরিসংখ্যানগতভাবে জলোচ্ছ্বাসের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীও তাদের নিজস্ব কণ্ঠে একই দাবি জানিয়ে আসছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্পষ্ট আহ্বান হলো, রাষ্ট্র যেন "একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের" সহায়তা করে। এটি কেবল ক্ষতিপূরণের দাবি নয় বরং নিজেদের অস্তিত্বের স্বীকৃতির দাবি। তাই এখানে উপস্থাপিত বিশ্লেষণটি কোনো নতুন ক্ষতি আবিষ্কারের দাবি করে না বরং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা তথ্য-উপাত্তকে একত্রিত করে একটি সামগ্রিক নীতি-বিশ্লেষণ তুলে ধরে। পরস্পর-সংযুক্ত এসব ব্যর্থতার মানবিক মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব। ২০১৪ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে রাখাইন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২,৫৬০ জন, অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩৫,০০০ জন। অর্থাৎ, এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে পটুয়াখালীতে রাখাইন গ্রামের সংখ্যা ১৪৪ থেকে কমে ২৬-এ এবং বরগুনায় ৯৩ থেকে কমে ১৩-তে নেমে এসেছে। জরিপের তথ্য থেকে ভবিষ্যতের প্রবণতাও স্পষ্ট হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী রাখাইনদের মধ্যে ২৪.৩ শতাংশ স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৯২.৮৬ শতাংশই গন্তব্য হিসেবে মিয়ানমারকে বেছে নিয়েছেন। আশ্রয়ের এই বিপরীতমুখী যাত্রা স্থানীয় এলাকায় নিজেদের শিকড় বা অস্তিত্বের ফুরিয়ে আসারই ইঙ্গিত দেয়। মিস্ত্রিপাড়ায় বয়োজ্যেষ্ঠরা মাত্র ১৫ থেকে ২০টি পরিবারের টিকে থাকার কথা উল্লেখ করেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তাঁদের সম্প্রদায় বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বাস্তুচ্যুতি এমন কোনো বিষয় নয় যা ভবিষ্যতে প্রতিরোধ করা সম্ভব; বরং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি বা ধরনটি এখন আর অস্পষ্ট নয়। জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক বর্তমান নীতিমালায় উপকূলীয় বাস্তুচ্যুতিকে মূলত কৃষি ও আবাসন-সংক্রান্ত সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। যার মধ্যে লবণাক্ততা, ফসলের ফলন, বাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্রের মতো বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় এবং এসব কাঠামোর মধ্যেই সমস্যাটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নীতিমালার নিজস্ব শ্রেণিবিন্যাসের সীমাবদ্ধতার কারণে যা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তা হলো সাংস্কৃতিক স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কবরস্থান, শ্মশান এবং মন্দিরের ভিত্তিকে 'গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো' হিসেবে গণ্য করা হয় না; ফলে এগুলোর ক্ষতিকে 'অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি ও লোকসান' হিসেবে দেখা হয়, যা কোনো পুনর্বাসন বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে না এবং অভিযোজন সংক্রান্ত কোনো সূচকেও তা পরিমাপ করা হয় না। এটিই হলো 'স্বীকৃতি-জনিত ঘাটতি' (Recognition Gap) নীতিগত ব্যর্থতার এমন এক সুনির্দিষ্ট ও প্রতিকারযোগ্য বিষয়, যা সম্পদ বা তথ্যের কোনো অভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি এমন এক প্রক্রিয়ার মূল কারণ যার ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ ছাড়াই উন্নয়ন সাধিত হয়; এটি উপকূলসুরক্ষার এমন এক ব্যবস্থা যা কোনো জনগোষ্ঠীর কৃষিজমিকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও তাদের নিজস্ব পরিচয়ের মূল ভিত্তিকেই বিলীন করে দেয়। সাংস্কৃতিক স্মৃতির কাঠামোকে সুরক্ষার যোগ্য অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করাই হলো সেই ন্যূনতম শর্ত, যার মাধ্যমে কুয়াকাটায় জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়াটি কেবল কারিগরি বিষয় হয়ে না থেকে প্রকৃত অর্থেই অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠতে পারে।

ভূমি দখল ও উচ্ছেদ (Land Grabbing and Eviction)

বাংলাদেশের রাখাইনদের বসতি মূলত নদী ও সমুদ্র উপকূল। পটুয়াখালী, বরগুনা থেকে শুরু করে কক্সবাজার, এ অঞ্চলের আদি নামগুলো রাখাইনদের ভাষায়। ১৭৮৪-১৯০০ সালের দিকে বরিশাল উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০ হাজারের বেশি রাখাইন বসবাস করত। ১৯০০-১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা হয় ৩৫ হাজার। ২০১৪ সালে কারিতাসের জরিপে, রাখাইন জনসংখ্যা ২ হাজার ৫৬১ জন। প্রবীণ রাখাইনদের সঙ্গে আলাপ করে মোট ২৩৭টি রাখাইন গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে ১৯২টি রাখাইন গ্রামের কোনো হদিস নেই। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় ২৮টি এবং গলাচিপা উপজেলায় ৪টি রাখাইন গ্রাম আছে। বরগুনার তালতলী উপজেলায় ১৩টি রাখাইন গ্রাম আছে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে প্রায় ৮০ ভাগ রাখাইন গ্রাম বেদখল হয়ে গেছে এবং জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৫ ভাগ। রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভূমি দখলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ নেই। এমনকি স্থানীয় সরকার সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনও নির্বিকার। বরগুনার তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের বেতুলিয়া (কবিরাজপাড়া) পাড়ায় ৭০ শতক আয়তনের এই পুকুরটি দখল হয়ে গেছে। ১৯৫৯ সাল থেকে দরবার চলছে। কলাপাড়া উপজেলার দিয়াড় আমখোলা গ্রামের পুকুরটিও দখল হয়ে গেছে। কালাচান পাড়া, থঞ্জুপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া, নায়রী পাড়ার রাখাইনদের পুকুরগুলো জবরদখল করে মাছ চাষ করা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট তীব্র, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুকুর দখল। রাখাইনদের পানি ব্যবস্থাপনার লোকায়ত সংস্কৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে দিন দিন তাদের কাছ থেকে নিজেদের পুকুর, কূপ ও ধারেকাছের খালগুলোও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেবল পুকুর বা কৃষিজমি নয়, মন্দির বা ধর্মস্থল নয়। মৃত্যুর পর শেষ ঠিকানা রাখাইনদের চানসাইগুলোও জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। রাখাইন ভাষায় চানসাই মানে শ্মশানভূমি। কলাপাড়ার ছয়ানীপাড়ার দেড়শ বছরের প্রাচীন শ্মশান থেকে শুরু করে তালতলী উপজেলার অংকুজানপাড়ার খাদ্যা সং চানসাই শ্মশান

দখল হয়ে গেছে। একই অবস্থা কলাপাড়ার থঞ্জুপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, দিয়াড় আমখোলা পাড়া, কালাচান পাড়া, তুলাতলী, নয়াপাড়া-বাবলাতলা, সোনাপাড়া, চৈয়পাড়া, হাড়িপাড়ার শ্মশানগুলোর ক্ষেত্রেও। অংকুজানপাড়া পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভূমিদস্যুদের অব্যাহত ভূমি আগ্রাসনের ফলে সংকুচিত হয়ে পড়েছে এই রাখাইন গ্রামের পরিধি। একসময় যেখানে অর্ধশতাধিক রাখাইন পরিবার বসবাস করত, সেখানে বর্তমানে মাত্র ১১ পরিবারের বসতি রয়েছে। অংকুজানপাড়ার শ্মশানভূমির একাংশ জনৈক প্রতিবেশী দখল করে বাড়ি নির্মাণ করেছে। সাতাশ হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছে বলে তিনি দাবি করলেও রাখাইন গ্রামবাসী বলেছেন, শ্মশান একটি দেবোত্তর সম্পত্তি, এটা বিক্রি করা যায় না। গ্রাম থেকে শ্মশানে শবদেহ নেওয়ার রাস্তাও ঘেরা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ভূমি দখলদারেরা। পায়রা বন্দরের জন্য ছয়ানী রাখাইন পাড়ার মন্দির পর্যন্ত সরিয়ে ঘরের কাছে নিতে হয়েছে। ছয়ানীপাড়ার তথাকথিত উন্নয়ন ও দখলের যেসব তাণ্ডব চলছে, তার ভেতর আত্মপরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোনো রাখাইন গ্রামের টিকে থাকা বিপজ্জনক।

পর্যটন শিল্পের প্রতিবন্ধকতা(Challenges to the Tourism Industry)

পর্যটন একটি অঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে পর্যটন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ও পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন। পর্যটনের উন্নয়ন স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামো, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের নীতিকাঠামো, বৈশ্বিক যোগাযোগব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। একই সঙ্গে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের বিষয়টিও পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার এখনো পর্যন্ত কুয়াকাটাকে বৈশ্বিক পর্যটন মানচিত্রে একটি দুর্লভ ও সম্ভাবনাময় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান কোনো পর্যটন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বায়নের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পর্যটন খাতও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনার অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সীমাবদ্ধতা এবং স্থানীয় জনগণের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের অভাব উল্লেখযোগ্য। ফলে কুয়াকাটার বিপুল পর্যটন সম্ভাবনা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। "অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, পর্যাপ্ত পরিবহন সুবিধার অভাব এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি"-পর্যটন বিকাশের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা। কিছুস্থানীয় সম্প্রদায় পর্যটনের উন্নয়নে সফল হয়েছে, আবার অন্যরা তা করতে পারেনি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো কিছু উন্নয়নশীল দেশ, যাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ, তারা কীভাবে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পর্যটননির্ভর উন্নয়নকে টেকসইভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, অথচ একই সঙ্গে তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য, পরিচয় এবং জীবনযাত্রার ধারা বজায় রাখতে পেরেছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত ক্রমাগত ভাঙনের শিকার হচ্ছে। এ কারণে বিনিয়োগকারী, পর্যটক, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। কুয়াকাটা পৌরসভার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর সমুদ্র কমপক্ষে ৩০ থেকে ১০০ ফুট সৈকতভূমি গ্রাস করছে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকলেই কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করার কথা জানিয়েছেন। তাদের মতে, প্রতি বছরই সৈকতের বিভিন্ন অংশ ভেঙে যাচ্ছে। কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকতের ক্রমাগত ভাঙন শুধু পরিবেশগত সংকট নয়; এটি পর্যটন অবকাঠামো, স্থানীয় অর্থনীতি, বিনিয়োগ, জীববৈচিত্র্য এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি। একজন ট্যুর অপারেটর বলেন আমি শুনেছি, সরকার শিগগিরই এ বিষয়ে কাজ শুরু করবে। জিওব্যাগ দিয়ে এক কিলোমিটার এলাকা রক্ষা করা হলেও এটি যথেষ্ট নয়। ১৮ কিলোমিটার একটি বিশাল এলাকা। সমুদ্রসৈকতের দুই পাশে থাকা দুটি নদীই এ ভাঙনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। এখানে যে ভাঙন হচ্ছে, সেটি শুধু সাধারণ বালু ক্ষয় নয়। কুয়াকাটায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং পর্যটন কার্যক্রম উভয়ই জীববৈচিত্র্য হ্রাসের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলজ প্রাণী যেমন অমেরুদণ্ডী প্রাণী, মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও তিমি-জাতীয় প্রাণীর সংখ্যা, বিস্তার, প্রজনন এবং চলাচলের ধরনে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, যা জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কুয়াকাটায় জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়কে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফল হিসেবে দেখলে হবে না। জলবায়ু পরিবর্তন, উপকূলীয় ভাঙন এবং অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রভাব এ সংকটকে আরও তীব্র করছে। তাই টেকসই পর্যটন নিশ্চিত করতে হলে কুয়াকাটার বন, সামুদ্রিক প্রাণী, উপকূলীয় প্রতিবেশ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। একজন সুপরিচিত স্থানীয় ট্যুর অপারেটর বলেন একসময় আমরা বলতাম এখানে লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া ছিল। তিন বছর আগে বলতাম হাজার হাজার কাঁকড়া আছে। দুই বছর আগে আপনি শত শত কাঁকড়া দেখতে পেতেন। আর এখন আমি বলি–ভাই, হয়তো আপনি এক-দুইটি কাঁকড়া দেখতে পাবেন, এমনকি একটিও নাও পেতে পারেন।

দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা (Poor Transportation Sztem)

যেকোনো পর্যটনকেন্দ্রে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য একটি সুসংগঠিত ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। কুয়াকাটার পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা। কুয়াকাটা-কলাপাড়া-পটুয়াখালী মহাসড়কের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে নাজুক। যদিও এই সড়কের নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তবে ধীরগতির কারণে সড়কটি এখনো যান চলাচলের জন্য পুরোপুরি সুবিধাজনক হয়ে ওঠেনি। ফলে কুয়াকাটায় আগত পর্যটক ও দর্শনার্থীদের প্রায়ই নানা ধরনের দুর্ভোগ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। কুয়াকাটার পরিবহন ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো নির্দিষ্ট বাস টার্মিনালের অনুপস্থিতি। বর্তমানে বাসগুলো সমুদ্রসৈকতের

আশপাশে সড়কের ওপর এলোমেলোভাবে পার্ক করা হয়। এর ফলে সেখানে নিয়মিত যানজট, শব্দদূষণ এবং বায়ুদূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে পর্যটনকেন্দ্রটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একজন হোটেল মালিক বলেনবর্তমানে বাস টার্মিনালের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। সব বাস সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি সড়কের ওপর এলোমেলোভাবে পার্ক করা হয়। এ কারণে সেখানে সবসময় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রচুর শব্দ ও বায়ুদূষণ হচ্ছে। কুয়াকাটায় কোনো নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড নেই। সব বাস রাস্তায় এলোমেলোভাবে রাখা হয়, যার ফলে যানজট সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়।

অপর্যাপ্তভাবে উন্নতপর্যটনকেন্দ্রসমূহ (Undeveloped Tourist Spots)

কুয়াকাটাকে এখনো একটি আকর্ষণীয় ও কার্যকর পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। কুয়াকাটার আশপাশে গঙ্গামতির বন, ফাতরার বন, মিস্ত্রিপাড়া বৌদ্ধ মূর্তি, রাখাইন পল্লী এবং শুঁটকি পল্লীসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এসব পর্যটনকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পর্যটন অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা নেই। তাই কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত ও আশপাশের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেনকুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। পর্যটকরা সকালে সূর্যোদয় দেখার জন্য যখন গঙ্গামতি চরে এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখার জন্য লেবুর চর/লাবুর চরে যান, তখন তাদের সৈকত ধরে হেঁটে যেতে হয়। যদিও এক পাশে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, সেটির কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বাঁধটি নির্মাণ শেষ হলে মানুষ বাঁধের ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল বা অন্য কোনো যানবাহনে উভয় দিকেই চলাচল করতে পারবে। আগে পর্যটকরা সহজেই এসব পর্যটনস্থানে যেতে পারতেন, কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই।

7. উপসংহার ও নীতিগত সুপারিশ (Conclusion and Policy Recommendations)

বর্তমান গবেষণায় কুয়াকাটা অঞ্চলে বসবাসরত রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, প্রাচীন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, ভূমি ও জীবিকা-সংকট, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবক্ষয় এবং কুয়াকাটা পর্যটন শিল্পের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুয়াকাটার রাখাইন জনগোষ্ঠীর বর্তমান সংকট কোনো একক বা সাম্প্রতিক সমস্যা নয় বরং ঐতিহাসিক বৈষম্য, ভূমি হারানো, অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। ঐতিহাসিকভাবে রাখাইন জনগোষ্ঠী কুয়াকাটা ও এর পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই তারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছে এবং ভারত বিভাজনের পর ভূমি, জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাদের অনিশ্চয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। ভূমি হারানোর ফলে শুধু তাদের বাসস্থান সংকুচিত হয়নি; কৃষি, তাঁতশিল্প, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাধিক্ষেত্র, শ্মশান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক স্থানের সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কও দুর্বল ও অনেকক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে রাখাইনদের ভূমি-সংকটকে কেবল সম্পত্তি হারানোর সমস্যা হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ভূমি তাদের অর্থনৈতিক উৎপাদন, সামাজিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুয়াকাটার রাখাইন জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণকে কেবল সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয় বরং উন্নয়ন নীতির সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনার অভাবও এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ। রাখাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতশিল্প তাদের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলেও কাঁচামাল সংগ্রহের জটিলতা বিশেষত সুতা সংগ্রহে নির্ভরতা, উচ্চ ব্যয়, বাজারব্যবস্থার দুর্বলতা এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে এ শিল্প ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এটি মূলত একটি সরবরাহ-শৃঙ্খলগত সমস্যা, যা যথাযথ সরকারি সহায়তা, স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও বাজার সংযোগের মাধ্যমে অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। রাখাইন সম্প্রদায়ের রয়েছে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি। রাখাইনদের মন্দির, সমাধিক্ষেত্র, শ্মশান, পুকুর, বসতভিটা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক স্থান তাদের সামাজিক স্মৃতি ও পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ ধারক। কিন্তু একুশ শতকে এসেও জলবায়ু পরিবর্তন, উপকূলীয় ভাঙন, ভূমি-দখল এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এসব স্থান যথাযথ সংরক্ষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব পাচ্ছে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি এখানে কেবল অর্থনৈতিক নয়। এটি সাংস্কৃতিক ও অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি ও লোকসানেরও কারণ। এই বাস্তবতা কুয়াকাটার উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণকে জলবায়ু অভিযোজনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। এই পরিস্থিতিকে বৃহত্তর জাতীয় ও এশীয় প্রেক্ষাপটেও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় ও পর্যটনকেন্দ্রিক অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পর্যটন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাপে পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পর্যটননির্ভর উন্নয়ন যদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার, অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে পরিচালিত হয়, তাহলে উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করলেও সামাজিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়কে তীব্রতর করতে পারে। তাই কুয়াকাটার পর্যটন উন্নয়নকে শুধু পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি বা অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে মূল্যায়ন না করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কুয়াকাটার পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রেও গবেষণায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। পর্যাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা ও পর্যটন অবকাঠামোর অভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিবেশদূষণ, প্লাস্টিক বর্জ্য, সৈকতভাঙন, পর্যটন ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং পর্যটনকেন্দ্রিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি কুয়াকাটার পর্যটন সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। অথচ কুয়াকাটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত, সূর্যোদয় ও

সূর্যাস্ত, রাখাইন পল্লী, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, মন্দির, শুঁটকি পল্লী, গঙ্গামতি ও ফাতরার বনসহ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ একে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুমাত্রিক পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। তাই এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশগুলো কাজে লাগানো হলে তা কুয়াকাটার পর্যটন-সহায়ক অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিনির্ধারক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে পারে।

- বাংলাদেশ সরকারের উচিত ইউএনডিপি (UNDP)-র সহায়তায় কুয়াকাটায় একটি 'রাখাইন কারুশিল্পী সরবরাহ সমবায় সমিতি' (Rakhine Artisan Supply Cooperative) প্রতিষ্ঠা করা। এটি হবে কাঁচামাল সংগ্রহের একটি কেন্দ্র যা পাইকারি হারে সুতা, রং ও তাঁতের সরঞ্জাম ক্রয় করে স্থানীয়ভাবে সুলভ মূল্যে বিতরণ করবে। এর পাশাপাশি একটি ঘূর্ণায়মান চলতি মূলধন তহবিল (Revolving Working-Capital Fund) গঠন করতে হবে, যাতে তাঁতিদের বাধ্য হয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি (Distress Sales) করতে না হয়। এটি সুতা সংগ্রহের সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে যা বয়নশিল্পের উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে রাখে এবং উপকূলীয় পর্যটন অবকাঠামোর জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থের সামান্য অংশ ব্যয় করেই পরিবারগুলোর আয় স্থিতিশীল করে তোলে।
- রাখাইনদের সাংস্কৃতিক স্মৃতিবিজড়িত স্থান যেমন শ্মশান, কবরস্থান এবং বৌদ্ধ মন্দিরের ভিত্তি গুলোকে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-এর লবণাক্ততা ও ভাঙন-প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা; কারণ বর্তমানে এই পরিকল্পনায় সুরক্ষার তালিকায় কোনো সাংস্কৃতিক সম্পদের উল্লেখ নেই। অথচ এই স্থানগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়টি নথিবদ্ধ রয়েছে। এগুলোকে সুরক্ষার যোগ্য অবকাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করলে 'অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি ও লোকসান'-এর বিষয়টি মূলধারার অভিযোজন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে, যা কেবল ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য দেওয়া ঐচ্ছিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না।
- ইউএনডিপি (UNDP) এবং বিশ্বব্যাংকের উচিত জাতিগত সংখ্যালঘুদের সরবরাহ-শৃঙ্খলের (Supply-Chain) দুর্বলতা বিষয়ক একটি নিরীক্ষা পরিচালনা করা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য উপকূলীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উপকরণ সংগ্রহের বাধাগুলো পদ্ধতিগতভাবে চিহ্নিত করা; যাতে কোনো সম্প্রদায়ের তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক ঘাটতি'-র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নয় বরং প্রকৃত সীমাবদ্ধতা বা সমস্যার ওপর ভিত্তি করে সহায়তা কার্যক্রম বা হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করা যায়।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিষয়ে এমন আইন অবশ্যই কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে যা সংখ্যালঘুদের প্রতি অসম আচরণ, হয়রানি এবং দৈনন্দিন জীবনে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষাবিদ বা নীতি নির্ধারকদের রাখাইন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া উচিত। তাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যেখানে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ন্যূনতম তহবিল দিয়ে রাখাইন ভাষার স্কুল পুনরায় চালু করা উচিত। সরকারের উচিত রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর নজরদারি ও সমর্থন বৃদ্ধি করা এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে নীতি পরিবর্তন করা। রাখাইনসহ দেশের সমতল অঞ্চলের সব জনজাতির বেহাত হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে একটি পৃথক ভূমি কমিশন করা এবং সেই সঙ্গে রাখাইনদের ভূমি বেদখল রোধকল্পে জেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।
- রাখাইনদের ভূমি বেদখল রোধকল্পে ১৯৫০ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারা যথাযথভাবে কার্যকর করা।
- বেদখলকৃত বৌদ্ধবিহার, শ্মশান ও রিজার্ভ পুকুর ও অর্পিত শত্রু সম্পত্তির নামে দখলকৃত জমি মুক্ত করে রাখাইন কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া
- সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীবিষয়ক আইএলওর ১০৭ নম্বর কনভেনশন অনুসারে, রাখাইন ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির ওপর ব্যক্তিগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকার সুনিশ্চিত করা।
- বিকৃত করা রাখাইন পাড়ার নাম রাখাইনদের নিজ নিজ ঐতিহ্যগত নামে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা এবং রাখাইনদের ঐতিহাসিক স্থানগুলোসহ নিজস্ব সংরক্ষিত এলাকা অধিগ্রহণ না করা।
- কুয়াকাটার রাখাইন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। যেমনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) অঞ্চলে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদের সম্পদ ও জমিজমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী পাচার রোধে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।
- রাখাইন নারীরা যৌন শ্রমের উদ্দেশ্যে মানব পাচারের শিকার হচ্ছে। এমনকি নতুন করে সহিংসতার শিকার হওয়ার আশঙ্কায় তারা অনেক সময় নিজেদের দুর্দশার কথাও প্রকাশ করতে চায় না। বাংলাদেশের সংবিধানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকলেও কুয়াকাটা অঞ্চলে বাস্তবে এসব অধিকারের যথাযথ প্রতিফলন খুব কমই দেখা যায়। তারা বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কিংবা ভিজিডি (VGD) কর্মসূচির মতো সরকারি সহায়তাও পায় না। তাই সরকারের এই অবস্থা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

- কুয়াকাটাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের বিপণন কৌশল ও প্রচারণামাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন প্রচারমূলক ভিডিও, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি করে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, ইউটিউব এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। বর্তমানে কুয়াকাটার নিজস্ব কোনো পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট নেই, যেখানে পর্যটনকেন্দ্রটির সব তথ্য একসঙ্গে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ওয়েবসাইটে কুয়াকাটা সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে, কিন্তু সেখানে বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও ব্লগে কুয়াকাটা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও দক্ষতা ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে সেগুলোর অনেক তথ্য নির্ভরযোগ্য বা যথাযথভাবে হালনাগাদ নয়।
- সমুদ্রসৈকতের পাশে অপরিকল্পিতভাবে হোটেল, মোটেল ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। এসব স্থাপনা সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই ভূমি ব্যবহার ও নির্মাণকাজের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।
- দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটাকে তুলে ধরার জন্য সরকারকে কার্যকর বিপণন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (BPC) ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (BTB)-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ওয়েবসাইট, ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুয়াকাটার প্রচারণা চালানো যেতে পারে। পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ট্যুর অপারেটর, পর্যটন সংস্থা, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশন এবং ভ্রমণবিষয়ক লেখকদের মাধ্যমে কুয়াকাটার প্রচার বাড়ানো যেতে পারে।
- সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন হোটেল-মোটেল এলাকায় কোনো ড্রেনেজ বা বর্জ্য অপসারণ ও শোধন ব্যবস্থা নেই। কোনো প্রকার শোধন ছাড়াই সমস্ত বর্জ্য সরাসরি সমুদ্রে ফেলা হয়। এর ফলে সৈকতের পরিবেশের অবনতি ঘটছে এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পর্যটন শিল্পের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। সৈকত থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা চালু করা উচিত। অনেক পর্যটক ভাটার সময় সমুদ্রে গোসল করেন। তাই নির্দিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা বেষ্টনী বা 'সি-নেটিং' (Sea-Netting) স্থাপন করা যেতে পারে। এ কাজের জন্য সরকারি লাইফগার্ড বা উদ্ধারকারী দল গঠন করা প্রয়োজন।

8. তথ্যসূত্র (References)

ভুঁইয়া, মো. এ. এইচ, মো. এ. দারদা (২০১৮), Socioeconomic Impacts of Coastal Tourism on Local Communities in Kuakata, Bangladesh, এডিবিআই (ADBI) *ওয়ার্কিং পেপার ১৪৩০*, টোকিও: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইনস্টিটিউট, ২০২৪।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, *বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)*, ঢাকা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রহমান, আসিফুর, সোহরাব হোসেন, কুয়াকাটায় পর্যটনের জন্য রাখাইনদের বর্জন, *দি ডেইলি স্টার*, ১৬ মে, ২০২২।

রহমান, সায়াদুর (২০১৭), বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় দক্ষিণ-মধ্য উপকূলীয় রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ-জনিত অভিবাসন বিএসসি (অনার্স) গবেষণা প্রকল্প, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রয়, আর. সি. (২০০০), বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের ভূমি অধিকার, *কোপেনহেগেন: আইডব্লিউজিআইএ*।

রহমান, এম. এম., আরিফ, এম. এস. আই., মাহদি, আই., রাফি, এম. এ., চিশতী, এম. এ., ও খান, এস. জে. (২০২২), জাতিগত সংখ্যালঘুদের ঘূর্ণিঝড়-ঝুঁকিপ্রবণতা: বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায়ের ওপর একটি কেস স্টাডি,*ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন*, ৮৩, ১০৩৪৪৯।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২), জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রাথমিক প্রতিবেদন, ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

কামরান, মাহমুদ, রহমান (২০২১), রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: কুয়াকাটায় একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা, *বরিশাল ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস* ২ (১), পৃ.১০১-১১৮।

হাসান, এস. আর.(১৯৮৫), ক্রুজিং: *দ্য সানি হরাইজন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম, দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৬(১), পৃ.৪১-৫৭।

পান্ডে, ভি. সি.(২০০৪), *এনভায়রনমেন্ট সিকিউরিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া*, ভারত: ইশা বুকস ।

গার্টনার, ডব্লিউ., ও লাইম, ডি. (২০০০), *ট্রেন্ডস ইন আউটডোর রিক্রিয়েশন*, লেজার অ্যান্ড ট্যুরিজম।

হাসান, এম. টি.(২০১০), ঘূর্ণিঝড় ও রাখাইন: আদিবাসীদের ধারণা, পূর্বাভাস ও টিকে থাকার কৌশল, *গ্রাসরুটস ভয়েস*, ৭(১)।

ক্রেসওয়েল, জন ডব্লিউ (২০১৮), *শিক্ষাগত গবেষণা: পরিমাণগত ও গুণগত গবেষণার পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং মূল্যায়ন, ৬ষ্ঠ সংস্করণ*, নিউ ইয়র্ক: পিয়ারসন।

সাক্ষাৎকার ডি১, একজন রাখাইন তাঁতির সাথে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, মিস্ত্রিপাড়া, কুয়াকাটা, ১০ ডিসেম্বর,২০২৫।

সাক্ষাৎকার ডি২, একজন রাখাইন সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠের সাথে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, মিস্ত্রিপাড়া, কুয়াকাটা, ১০ ডিসেম্বর,২০২৫।

ব্রাউন, ভার্জিনিয়া, ক্লার্ক (২০০৬), মনোবিজ্ঞানে থিম্যাটিক বিশ্লেষণের ব্যবহার, *কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ইন সাইকোলজি*, ৩(২), পৃ.৭৭-১০১।

আমিন, এ. (২০০৯), *আরাকান ইতিহাস বোঝার প্রচেষ্টা (পর্ব-১)*: মিয়ানমারের আরাকানে জাতিসত্তার প্রশ্নের ওপর একটি গবেষণা, MERHROM, মিয়ানমার।

হাসান, কে. (২০১৫), রাখাইন, *বাংলাপিডিয়া অনলাইন*।

রান্টা, জি. (২০০৭), আরাকান রাজ্যের (মিয়ানমার) সমকালীন বৌদ্ধধর্ম: সমাজে এর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, *জার্নাল অব পালি অ্যান্ড বৌদ্ধ স্টাডিজ*।

আমিন, এ. (২০০৯), *আরাকান ইতিহাস বোঝার প্রচেষ্টা (পর্ব-১)*: মিয়ানমারের আরাকানে জাতিসত্তার প্রশ্নের ওপর একটি গবেষণা, MERHROM, মিয়ানমার ।

করিম, এ. (২০২০), বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: একটি পর্যালোচনা, দ্য নিউ নেশন, অনলাইন, ২৮ অক্টোবর, ।

তদেব

তদেব

ফারজানা, ফাওজিয়া (২০১৪), দরিদ্র-বান্ধব পর্যটন: বাংলাদেশের কুয়াকাটা সমুদ্র-সৈকতের দরিদ্রদের জন্য সুযোগ উন্মোচন, *জার্নাল অফ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স* ৭, পৃ.১-১৩।

প্রথম আলো, ২২ মার্চ, ২০১৭।

কলাপাড়ায় ৭ হাজার রাখাইন পরিবার ছিল এখন ১১০০, *প্রথম আলো*, ১৯ মার্চ, ২০১৮।

জান্নাত, দখল ও উচ্ছেদ: বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় রাখাইনরা, *দ্য ডেইলি স্টার*, ৩ অক্টোবর, ২০২৫।

কোমেরিও, এন., এফ. স্ট্রোজি (২০১৯), পর্যটন ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব: গ্রন্থপঞ্জিভিত্তিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে একটি সাহিত্য পর্যালোচনা, *ট্যুরিজম ইকোনমিক্স*, ২৫(১), পৃ. ১০৯-১৩১।

কিনসেং, আর. এ., এফ. টি. নাসদিয়ান, এ. ফাতচিয়া, এ. মাহমুদ এবং আর. জে. স্ট্যানফোর্ড (২০১৮), ইন্দোনেশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়ন: আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ? *এশিয়া প্যাসিফিক জার্নাল অব ট্যুরিজম রিসার্চ*, ২৩(১১), পৃ.১০৬২-১০৭২।

রহমান, রহমান, এ. নাহার (২০১৫), কুয়াকাটার অবস্থা: বাংলাদেশের একটি অবহেলিত প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সম্পদ, *ইউরোপিয়ান সায়েন্টিফিক জার্নাল*, ১১৫:, পৃ.৮৭-৯৮।

সেসানা, এলেনা, আলেকজান্দ্রে এস. গ্যাগনন, কিয়ারা চিয়ানতেল্লি, জোঅ্যান ক্যাসার, জন জে. হিউজ (২০২১), সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: একটি সাহিত্য পর্যালোচনা, *WIREs Climate Change*, ১২(৪): ৭১০, ।

চক্রবর্তী, সংঘমিত্রা , এম. এ. রাকিব (২০২৬), উপকূলীয় বাংলাদেশে জলবায়ু-প্ররোচিত অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি ও লোকসান পরিমাপ: নীতিনির্ধারণে সহায়তা, *ইভলভিং আর্থ* ৪: ১০০১৩৮ ।

হোসাইন, আফজাল (১৯৯৯), বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিপণন: কার্যসম্পাদন ও কৌশলের একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

জুয়েল, এম. জে. আই., কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের ভাঙন খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে, *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ২০২০।

সাক্ষাৎকার ডি৩, একজন ট্যুর গাইড অপারেটর এর সাক্ষাৎকার, কুয়াকাটা, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫।

এফই অনলাইন রিপোর্ট, দূষণ ও অব্যবস্থাপনার কারণে কুয়াকাটা পর্যটন সম্ভাবনা হারানোর হুমকিতে, *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২৮ মে, ২০২১।

সাক্ষাৎকার ডি৪, একজন হোটেল মালিক এর সাক্ষাৎকার, কুয়াকাটা, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সাক্ষাৎকার ডি৫, একজন নিরাপত্তা কর্মীর সাক্ষাৎকার, কুয়াকাটা, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫।